রোয়াকি ১।।

শ্যামল ও সাবভারশন

রোয়াকি মানে রোয়াকে বসে রোয়াবি। রোয়াক আর কেন? রোয়াব দেখানোর জন্যে। আর কোথায় দেখাব? দেখবে কে? কিন্তু, গুরু, রোয়াকে বসলেই রোয়াকি হয়না, হওয়ানো জানতে হয়, সবাই জানেনা সেটা, কেউ কেউ জানে। শ্যামল জানত।

সেদিন শ্যামলের সঙ্গে দেখা হল। হাতে একটা ফোল্ডার। প্রেস করছে, ছোটো ছোটো কাজকে ও এখন জব-ওয়ার্ক বলে ডাকে, সেই জবের খোঁজে চলেছে দার-বে-দার। আর একজন জবলেস। জাস্ট এটুকুই। আর কিচ্ছু না। সেই শূন্যতা শ্যামলের চোখে। এদিকে বাচ্চা বড় হচ্ছে, বড় হচ্ছে খরচ। বৌয়ের থাইরয়েড হাইপো। এলট্রক্সিন বাড়ছে সময়ের সঙ্গে। এক দুই তিন চার : সমান্তর দুর্গতি।

আমাকে, আমাদের একদিন রোয়াকির মত রোয়াকি দেখিয়েছিল শ্যামল। সে এক পৌরাণিক যুগ, ছ্যাতলাপড়া মুলিবাঁশের বেড়ায় আলকাতরা করা গামারকাঠের জানলা বসানো পার্টি অফিস ভেঙে পাকা দালান উঠছে। পার্টির কন্ট্রাক্টরদের কন্ট্রাক্টরদের পার্টি করে তোলার শুরুয়াত সেই তখন। ইঁটের পাঁজার উপর বসে পথেবত্ত সাথী ধরালাম। কেশব বিড়ি আমায় কেউ দিলেও খেতাম না, ভসভসে লাগত, এত হালকা, প্রাত্যহিক গাঁজার অভ্যেশ তখন সদ্য পিছনে ফেলে এসেছি। বিকাশ বলেছিল শেষ টানটা দিস।

সেই শ্যামল তখন এখনকার শ্যামলের একটা উরুর মত সরু, মুখে প্রচুর দাড়ি, আর তেল মাখানো কাঁচের গুলির মত জ্বলজ্বলে দুটো চোখ, আমাদের 'মরালিটির প্রয়োজন' শেখাচ্ছিল, মানে একটি বাবা কী বলে তার ছেলেকে নৈতিকতা শিখিয়েছিলেন, সেটা আমাদের শোনাচ্ছিল।

আমরা তার আগেই সমস্ত দিকে সতর্ক সন্ত্রস্ত দৃষ্টি দিয়ে নিয়েছিলাম। কলেজের করিডোরে একটা ক্লাস থেকে আর একটা ক্লাসে যেতে যেতে একটি ছেলে যখন আর একটি ছেলেকে "এই যৌনাঙ্গ" বলে ডাকে, তখন সত্যিই সেই সময়ের আমাদের সেই সন্ত্রস্ততাকে ভেবে নেওয়া শক্ত। তখন সন্ন্যাসী রাজায় কেঁদো সুপ্রিয়ার সঙ্গে ডাক্তার যেসব ইয়ে করেছিল সেটা আসার আগেও মায়ের নির্দেশ মোতাবেক বাধ্য বাচ্চারা মা যেদিকে বসে আছে সেই দিকের চোখটা বন্ধ করে নিত।

সিনেমায় নাই-টুকুও দেখা যেত কেবলমাত্র ভ্যাম্পদেরই। নায়ক-নায়িকারা সব রাজলক্ষ্মী-শ্রীকান্তর মত, সারারাত একবিছানায় থেকেও জাস্ট পরস্পরের ঠ্যাঙে নাক ঘষে কাঁদে। আর কিছু করেনা তারা, কিচ্ছু না। এই দেখুন, কেলোটা লক্ষ্য করুন, এই বাতেলাটাও শ্যামলেরই — এই সমস্ত বিষয়ে আমার পুরো মতামতটাই এমনভাবে আমাদের রোয়াকমাস্টার শ্যামলের দ্বারা প্রভাবিত, (নকল বলতে নেই, বলতে হয় প্রভাবিত) ওর কথাবার্তার বাইরে আমি যেতেই পারিনা। রাজলক্ষ্মী-শ্রীকান্ত এই ঘাপলাটাকে এইভাবে প্রথম দেখেছিল শ্যামল, এবং সেই দেখা দিয়ে আমার এবং আমার মতো আরো অনেকের মতামত তৈরি করে দিয়েছিল, যে মতামত আমি আজো ক্যারি করে চলেছি।

যাকগে, যা বলছিলাম, বাবার ছেলেকে নীতি শেখানোর গল্পটা। ওর অননুকরণীয় ভঙ্গীতে শ্যামল শোনাচ্ছিল (শ্যামল যা ভালো নকল করত না, ওর আমাকে নকল করা দেখে আমি নিজেও আমার ম্যানারিজমগুলোকে চিনে নিতে পারতাম)।

গোনোরিয়ার চিকিৎসা করিয়ে ছেলেকে ভালো করে তুলে, বাবার মনে হল, বাবা হিশেবে তার এবার কিছু বলা উচিত। বলল, দেখো বড়খোকা, এবার নিজেকে শোধরাও, ওসব জাগায় আর যেয়োনা, নইলে শুধু তোমার কেন, আমাদের সবার, সারা সমাজের ভবিষ্যত অন্ধকার। আমরা তো সামাজিক জীব — এটা বোঝো।

দেখো বড়খোকা, আজ যদি তোমার ওসব হয়, তাহলে, তুমি তো জানোই, আর কী বলব, তোমাদের লতা-বৌদির হবে, যদি লতার হয় তো আমার হবে, আমার হলে তোমার মার হবে, তোমার মার হলে তোমার কাকার হবে, কাকার হলে কাকিমার হবে, কাকিমার হলে পাড়ার পল্টুদার হবে, পল্টুর হলে তোমার দিদির হবে, আর তোমার দিদির হলে, তুমি তো জানোই বাবা, আর কী বলব বলো, নিজের মুখে, নিজেদের ফ্যামিলির কথা, জগত শুদ্ধ সবার হবে, কারোর আর বাকি থাকবে না। তাহলেই বলো, গোটা সমাজের স্বার্থেই তোমার ওসব জায়গায় যাওয়া ছেড়ে দেওয়া উচিত।

শ্যামলের এই রোয়াক-রসিকতাটার ভিতর, অনেকগুলো মজা আছে। পরিবারটাকে অন্দর বলে আর পরিবারের বাইরেটাকে যদি বাহির বলে ভাবি, তাহলে, রসিকতাটার গঠনটাকে ভাবুন — বাহির-অন্দর-বাহির-অন্দর-অন্দর/বাহির-অন্দর-বাহির-অন্দর-বাহির। প্রথম বাহির, মানে ওসব জায়গা আর শেষ বাহির মানে পাড়া-কাম-জগত, এদুটোই বৃহত্তর সমাজ। চার বার অসুখটা বাহির থেকে অন্দরে এসেছে এবং তিনবার ফেরত গেছে বাহিরে। বাহির একবারও বাহিরে ছড়িয়ে দেয়নি। কিন্তু অন্দর-অন্দর পারস্পরিকতা ঘটেছে তিনবার — বাবা-মা, মা-কাকা, কাকা-কাকিমা। এর মধ্যেও প্রথম আর তৃতীয়টা আইনসম্মত। তাহলে পুরো রসিকতাটা ভীষণভাবে দাঁড়িয়ে আছে একটা অন্দরের ব্যাভিচারের উপর, মা এবং কাকার। মা নামক প্রতিমার ব্যাভিচারই এই পুরো গতিটার কেন্দ্রবিন্দু।

যাইহোক, ওসব জায়গা নিয়ে বেশি কথা বলাটা বোধহয় দস্তুর নয়। এমনকী সেটা ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক ভাবেও সত্যি। বেতাল পঞ্চবিংশতিতে, বিদ্যাসাগরের অনুবাদে, এইরকম একটা পরিস্থিতিতে বিক্রমাদিত্য ঈষৎ হেসে চুপ করে গেছিলেন।

"বেতাল কহিল, মহারাজ!

দাক্ষিণাত্য দেশে ধর্মপুর নামে নগর আছে। তথায়, মহাবল নামে, মহাবল পরাক্রান্ত মহীপতি ছিলেন। এক প্রবল প্রতিপক্ষ রাজা, চতুরঙ্গিণী সেনা লইয়া, তদীয় রাজধানীর অবরোধ করিলে, রাজা মহাবল, স্বীয় সমস্ত সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে, সমরসাগরে অবগাহন করিয়া, অশেষ প্রকার প্রতীকারচেষ্টা করিতে লাগিলেন কিন্তু, দৈবদুর্বিপাকবশতঃ, ক্রমে ক্রমে, স্বপক্ষীয় সমস্ত সৈন্য ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, নিতান্ত নিরুপায় হইয়া, প্রাণরক্ষার্থে, মহিষী ও তনয়া সমভিব্যাহারে, অরণ্যপ্রস্থান করিলেন। পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া, তিন জনেই অতিশয় ক্ষুধার্ত হইলেন। তখন রাজা, মহিষী ও তনয়াকে তরুতলে অবস্থিতি করিতে বলিয়া, আহারোপযোগী দ্রব্যের আহরণার্থে গমন করিলেন।

সায়ংকাল উপস্থিত হইল। রাজা প্রত্যাগত হইলেন না। রাজমহিষী ও রাজকুমারী, রাজার অনাগমনে, নানা অনিষ্টের আশঙ্কা করিয়া, যৎপরোনাস্তি বিষণ্ণ হইয়া, অশেষবিধ চিন্তা করিতে লাগিলেন। ঐ দিনে, কুণ্ডিনের অধিপতি রাজা চন্দ্রসেন, আপন জ্যেষ্ঠ পুত্রকে লইয়া, ঐ অরণ্যে মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহারা, তাদৃশ নিবিড় অরণ্যমধ্যে, অসম্ভাবনীয় নরচরণচিহ্ন দেখিয়া,

বিস্ময়ান্বিত চিত্তে, নানাপ্রকার কল্পনা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে, পুংবিলক্ষণ লক্ষণ দ্বারা, উহা স্ত্রীলোকের পদচিহ্ন বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। রাজা কহিলেন, চরণচিহ্ন দর্শনে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, দুই নারী, অচিরে, এই স্থান দিয়া, গমন করিয়াছে। চল, চারিদিকে অন্বেষণ করি।

পিতা-পুত্রে, অন্বেষণ করিতে করিতে, সায়ংসময়ে দেখিতে পাইলেন, দুই পরম সুন্দরী রমণী, তরুতলে উপবিষ্ট হইয়া, বাষ্পাকুল লোচনে, পরস্পর বদননিরীক্ষণ করত, যূথবিরহিত কুররীযুগলের ন্যায়, প্রগাঢ় উৎকণ্ঠায় কালযাপন করিতেছে। অবলোকনমাত্র, উভয়েরই অন্তঃকরণে অতিপ্রভূত কারুণ্যরস আবির্ভূত হইল। তখন তাঁহারা, স্নেহগর্ভ সম্ভাষণ পুরঃসর, অশেষপ্রকারে সান্ত্বনা ও অভয়প্রদান করিয়া, তাঁহাদিগকে রাজধানীতে লইয়া গেলেন। কিছুদিন পরে, রাজা রাজকন্যার, রাজকুমার রাজমহিষীর, পাণিগ্রহণ করিলেন।

ইহা কহিয়া, বেতাল জিজ্ঞাসা করিল, মহারাজ! এই দুই নারীর সন্তান জন্মিলে, তাহাদের পরস্পর কি সম্বন্ধ হইবেক, বল। রাজা বিক্রমাদিত্য, ঈষৎ হাসিয়া, মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন।”

বেতাল পঞ্চ বিংশতির শেষ গল্পের শেষ লাইনে এটাই বিক্রমাদিত্যের শেষ হাসি, লাস্ট লাফ। এই ঈষৎ হাস্য এবং মৌনাবলম্বন — এছাড়া আর কীই বা করার থাকে আমাদের। চারপাশে যখন পুত্র প্রপৌত্র এবং তস্য পুত্রদের রাজত্ব। জনশ্রুতি অনুযায়ী এরা সব দেবতাদের মানে ঠাকুরদের বংশধর। রবীন্দ্রনাথের বাচ্চারা। আর আমরা, বেজন্মার বাচ্চারা, মানে ভরতের, ভারতবর্ষের লোকেরা, আমরা জানি — ঠাকুরদের অবমাননা করতে নেই। ওতে চাকরিতে পদোন্নতি আটকে যায়, পেটে তিনমাসের বাসি মল জমে পক্ষাঘাত অব্দি হয়, আর তপস্যান্তে ব্রহ্মলাভ তো হয়ে দাঁড়ায় লাল কিল্লা পর লাল নিষাণ — মানে ফ্যান্টাসি।

তাই আমরা আজকাল এলাকা ভাগ করছি। ঠাকুরদের বটঠাকুরদের একটা এলাকা, যেখানে সংযম, হ্যাঁ, সংযমই হল মন্ত্র। যেখানে কুঁচকিতে দাদ হলেও, প্রাণপণে দাঁতে দাঁত কামড়ে, আঙুল বোলাতে হয় কপালে, আর গভীর গভীরতর চিন্তাবিদ গ্রুভ কপালে ফুটিয়ে, শান্তিনিকেতনের লোকেদের রবীন্দ্রসঙ্গীত গাওয়ার গলায় (ওঃ, শ্যামল যা দেখাত না, একদিন রোয়াকে আসবেন, যতটুকু পারি করে দেখাব, মানে, শোনাব) বলতে হয়, ‘সংস্কৃতি হল মনন আর অধিমননের একটা আত্যন্তিক সংযুতি’, বা এধরনেরই আর কিছু, যা আমাকে তো ছেড়েই দিন, আমার বাপের বাপও কোনোদিন বোঝেনি।

তাই আমরা, এই আবাগির বেটাবেটিরা, সমস্ত পেঁচোয় পাওয়া লোকেদের জন্যে ছাড়া থাকে আমাদের এই নিজস্ব এলাকা, আমাদের রোয়াক। এখানে আমরা যা খুশি তাই লিখব, ডেকে আনব শ্যামলকে, শ্যামলদের। আর আপনারা যারা ক্যাম্বিসের জুতো পরে লম্বা হাতা লম্বা পেট ব্লাউজ পরে মোরামের উপর হাঁটতে হাঁটতে বাইরে রাস্তায় দেখতে পেতেন, মানে, আসলে পেতেন না, বাইরে জীবন বেঁচে আছে, আর বৈঠকখানা ঘরে ভূপতির বন্ধুরা সব বিলেতের রাজাবদলের উৎসব করত, মাঝের ঘরে অমল পিয়ানো বাজাতে বাজাতে পিয়ানোর গলায় গাইত, মেডিটেরানিয়ান, মেডিটেরানিয়ান, মেডিটেরানিয়ান, তার ঠোঁটে ভেসে উঠত সরোজিনী নাইডুর প্যালাঙ্কুইন বিয়ারারের স্বপ্নিল হাসি, যেকোনো স্বপ্নের হাসি হলে চলবেনা বাওয়া, এসব ব্রাহ্মদের ব্যাপার, পরে শোনা যায়, যারা নাকি সব বালিগঞ্জ এলাকায় বাড়ি কিনেছিল আর সিপিআই হয়ে গেছিল, — আপনাদের এখানে আসতে নেই। আপনারা, বাংলা-সংস্কৃতির দাদু ও

দিদিমারা, আমাদের পত্রিকা কিনে পাতায় পাতায় মুখখিস্তির গুঁতোয় যাদের ট্যাক্সিভাড়া খরচ করে কলেজস্ট্রিট এসে ফেরত দিয়ে যেতে হয়েছিল, আপনারা সেই সুসংস্কৃত কুমার ও কুমারীরা, সেই উপনিষদের আদিমন্ত্র উপাসক সত্যম শিবম সুন্দরম নারায়ণ ও নরেরা, আপনারা প্লিজ রোয়াকের পাতা ওল্টাবেন না। এর লেখা পড়বেন না, সাবধান কিন্তু, তাতে আপনাকে কেন্দ্র করে সাত কিলোমিটার ব্যাসার্দ্ধের প্রতিটি গর্ভবতী যুবতীর গর্ভপাত হয়ে যেতে পারে।

আমরা এখানে শ্যামলকে ডাকব, শ্যামল আমাদের গল্প শোনাবে। শ্যামল, প্লিজ একটু ভালো থাক, তোর প্রেসের জব-ওয়ার্কের কাজ, তোর বউয়ের হাইপো-থাইরয়েড, তোর সমস্ত রক্তপাতের পরও, প্লিজ, নইলে আমাদের রোয়াকি করে দেখাবে কে? ধৃষ্টতার ঔদ্ধত্যের পাঠ দেবে কে? তোর সেই রাস্তার কুকুরের জোকটা মনে কর। একটা কুকুর দিনের বিভিন্ন সময়ে, আলাদা আলাদা এলাকায়, আলাদা আলাদা মুডে, কেমন আলাদা আলাদা করে মূত্রত্যাগ করে। আমি এখনো চোখ বুজলেই দেখতে পাই, তুই রাত্তিরের রাস্তায় এক ল্যাম্পপোস্ট থেকে আর এক ল্যাম্পপোস্টে ঘুরে ঘুরে মাটি ছোঁড়ার মত করে পা ঘষে ঘষে দেখাচ্ছিস। মাইরি শ্যামল, দাঁতে দাঁত চেপে বেঁচে থাক, কলকাতায় সব কুকুরের গলাতেই বকলস ঝুলছে আজকাল, আওয়ারা দিওয়ানা কুত্তার সংখ্যা ভীষণ ভীষণ কমে যাচ্ছে, সংস্কৃতির দিকচিহ্নগুলোর গোড়ায় গোড়ায় মোতার লোক কই?